গড়িয়া পূজা

গড়িয়া পূজা

সত্যমেব জয়তে

উপজাতি গবেষণা অধিকার
ত্রিপুরা সরকার

সম্পাদনায়
এম. দামোদরন

তথ্য সংগ্রাহক
রাজেন্দ্রজীৎ দেববর্মা
লিংগুয়িসটিক্
অফিসার।

মুদ্রণ
প্রিন্ট বেষ্ট
আগরতলা

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৭৬
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ বইমেলা ১৯৯৯

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা

দুটি কথা

ত্রিপুরার উপজাতি বিশেষ করে ত্রিপুরী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া ও রিয়াং সাধারণতঃ এই কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই "গড়িয়া পূজা" অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গড়িয়া পূজার পদ্ধতি, রীতিনীতি ও সামাজিক কাঠামো অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। তবুও উদ্দেশ্য মূলতঃ এক।

'গড়িয়া পূজা' ত্রিপুরার বিশেষ কয়েকটি উপজাতিদের এক মহান গৌরবময় পূজা ও উৎসব। তাদের সমাজে এই পূজা কোন্ যুগ থেকে চলে আসছে তা বলা শক্ত কিন্তু বয়সের দিক দিয়ে এই পূজা-উৎসব অনেক সু-প্রাচীন বলতে হবে। গড়িয়া দেবতা তাদের পরম আরাধ্য দেবতা। তাঁর আশীর্ব্বাদ ব্যতীত জাগতিক কল্যাণ, সুখ শান্তি, ভোগ বিলাস ও অস্তিত্ব কোনটাই সম্ভব নয়—এটাই হল উপজাতিদের বদ্ধমূল ধারণা ও বিশ্বাস। তাই দেখা যায়, আরাধ্য দেবতাকে পরম ভক্তিভরে শ্রদ্ধা নিবেদন করার অভিপ্রায়ে প্রতিটি উপজাতি নরনারী পূজার এই শুভদিনটির জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকে। সেই দিনটিতে তারা প্রাত্যহিক জীবনের দৈন্যতা ভুলে নাচ-গান, হাসি ঠাট্টায় মশগুল হয়ে থাকে।

এ পুস্তিকায় শুধু ত্রিপুরী ও জমাতিয়া সম্প্রদায়ের গড়িয়া পূজার পদ্ধতি, রীতিনীতিগুলি তুলে ধরা হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের গড়িয়া পূজা পদ্ধতি, রীতিনীতির পার্থক্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বিগত ১৯৭৬ ইং সালে এই পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পাঠক ও গবেষক সমাজে এই পুস্তিকাটি চাহিদা দেখে তা পুনঃ মুদ্রিত হল।

এস কে সরকার
অধিকর্ত্তা
উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের গড়িয়া পূজা

এককালে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, হালাম ও কুকিই ছিল প্রধান। রাজা প্রজা সকলেই ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও শিবভক্ত। আর স্বভাবতঃই হিন্দুর সংস্কৃতি ও ধর্ম উৎসব এখানকার জাতীয় উৎসব। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই জাতীয় উৎসব গড়ে উঠে। দক্ষিণ ভারতে যেমন ''ওনাম'', মধ্য ভারতে ''গণেশ চতুর্থী'', উত্তর ভারতে ''দশেরা'', বাংলাদেশে ''দুর্গাপূজা'', আসামে ''বিহু'', ত্রিপুরায় ও তেমনি ''গড়িয়া পূজা''।

ত্রিপুরীদের গড়িয়া পূজা মহাবিষুব সংক্রান্তি বা চৈত্র সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ হয়। বৈশাখের প্রথম সাতদিন ধরে এই উৎসব পালিত হয়। গড়িয়া পূজা মানে ''শিব পূজা'' মতান্তরে ''গণেশ পূজা'' ও বলা হয়। পার্ব্বত্য আদিবাসী ও সমতলবাসীদের নূতন বছরের সার্বিক উন্নতি বিশেষ করে কৃষির উন্নতি ও শারীরিক কল্যাণ কামনা করে গড়িয়া পূজা দেওয়া হয়। গড়িয়া পূজার অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। যে কেহ ইচ্ছে করলেই গড়িয়া পূজা দিতে পারেনা। ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের মধ্যে গড়িয়া পূজা ছাড়াও শিব চতুর্দ্দশী, চতুর্দ্দশ দেবতা পূজা, গাং পূজা, কের পূজা ইত্যাদি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে গড়িয়া পূজাই বিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

হারি বিষু

গড়িয়া পূজার এক সপ্তাহ পূর্বে ''চৈত্র সংক্রান্তি'' উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ঐ দিনটিকে ত্রিপুরী ভাষায় ''হারি বিষু'' বলা হয়। হারি বিষুর দিন খুব ভোরে প্রথমেই বিভিন্ন রকমের বনজ ফুল বন থেকে সংগ্রহ করা হয়। এরপর হাতে কাটা সুতো দিয়ে মালা তৈরী করা হয়। মালাতে জুমের তুলোও দেওয়া হয়। মালা তৈরী হয়ে গেলে গরু মহিষের সামনের দুটো পা ধুয়ে, ধূপধূনা দিয়ে তাদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। ''হারি বিষু'' উপলক্ষে হাল-চাষও বন্ধ রাখা হয়। এরপর পাড়ার বয়স্ক ব্যক্তিরা 'লাঙ্গা' (বেতের তৈরী লম্বা ঝুড়ি) দা ও টাক্কাল নিয়ে বনে যায় নানাজাতের গাছের শিকড়, লতাপাতা ও ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করতে। এদিকে ঘরের স্ত্রীলোকেরাও সহস্র রকমের শাক্‌সব্জি সংগ্রহ করে রান্না করে। বন থেকে সহস্র জাতের লতাপাতা ও ফল মূল সংগ্রহ হয়ে গেলে বাড়ীতে এসে সবাই মিলে পাতাপোতায় বেটে ঔষধ তৈরী করে। ঔষধ তৈরী হয়ে গেলে পর প্রত্যেকেই সামান্য পরিমাণে মদ দিয়ে খেয়ে নেয় ও উহা প্রত্যেকের ঘরেও ভাগ করে দেওয়া হয়। পেটের রোগে মহৌষধ বলে তারা সারা বছর ইহাকে সযত্নে তুলে রাখে। পেটের রোগ হলে মদ দিয়ে মিশিয়ে খেয়ে নেয়। ঐদিন বয়স্করা ঘরে ঘরে গিয়ে সারাদিন মদ খেয়ে মশগুল হয়ে থাকে। এভাবে প্রায় একপক্ষ কাল প্রতি পাড়ায় পাড়ায় মদ্যপান চলে আর তার সাথে সাথে বিভিন্ন রকমের গানও।

গড়িয়া পূজা ও উপকরণ

হারি বিষুর দিনই গড়িয়া পূজার ঘট বসানো হয়। পূজার প্রস্তুতিও চলে সেদিন থেকেই। প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজার প্রস্তুতি আরও পূর্ব্ব থেকেই সুরু হয়। ''খের ফাং'' (গড়িয়া দেবের রক্ষক) কোন্ গ্রামের ও কে মনোনীত হবেন তার তোড়জোড় চলে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই। গড়িয়া পূজা জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠিত হয় হারি বিষুর সাত দিনের দিনে। ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে 'চৈত্র সংক্রান্তি' বা ''হারি বিষুর'' দিন ঘট না বসিয়ে শেষ দিন অর্থাৎ সাত দিনের দিনে বসিয়ে পূজা দেয়। পূজার দিন গৃহস্বামী খুব ভোরে পবিত্র কাপড় পরে বনে গিয়ে পাতাসহ একটি আস্ত কচি বাঁশ কেটে আনে এবং ইহা উঠানের পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে গেড়ে দেয়। ইহা সাধারণতঃ 'অচাই'য়ের মতামত নিয়েই গাড়া হয়। এরপর গৃহস্বামী অথবা 'বারুয়া' (পুরোহিতের সহকারী) বাঁশের আগায় হাতে কাটা সূতা দিয়ে ফুল ও তুলার মালা তৈরী করে এবং ইহা বাঁশের আগায় ঝুলিয়ে দেয়। ইহা ছাড়া হাতে বোনা নূতন ''রীছা'' (রীয়াও) বাঁশের আগায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। রীছায় ''গিট'' দেওয়া থাকে। গিটের ভেতরে তুলা ধান ইত্যাদি থাকে। আদিবাসীদের প্রত্যেকটি পূজায় রীছা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রীছা শুধু বক্ষ আবরনীই নয়, শুভ কাজে পূজা পার্বনে রীছার ব্যবহার আদিবাসী সমাজে এক পৌরাণিক প্রচলিত প্রথা। শুভ কাজে পূজা পার্বনে রীছা ব্যবহারের অন্তর্নিহিত অর্থ যেমন সুগভীর, তেমনি প্রাণবন্ত। আদিবাসী সমাজের প্রবীণ ও জ্ঞানীরা বলে থাকেন—নিজ আরাধ্য দেবতাকে মনে প্রাণে হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে অর্চ্চনার প্রতিভূরূপেই রীছার ব্যবহার পূজা পার্বনে হয়। তাই, পার্বত্যবাসীদের প্রতিটি পূজায়, শুভ কাজে আজো দেখা যায়, কখনো রীছা জড়িত রয়েছে দেবতার গায়ে, আর কখনোবা আচ্ছাদিত রয়েছে আসনে। এ রীতি প্রথা নিয়ে প্রচলিত প্রবাদ, উপাখ্যান ইত্যাদি আজো ছড়িয়ে রয়েছে গহনারন্যের এখানে ওখানে বসবাসকারী উপজাতি সমাজে।

ইতিহাস বলে, ত্রিলোচন জননী রাণী হীরাবতী একদিন দুপুর বেলায় ঝর্ণার জল আনতে গিয়েছিলেন। এমন সময় দেখলেন অনতি দূরে বুনো মহিষ ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করে মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর দেখলেন সম্মুখেই একটি শিমুল বৃক্ষশাখে ভীত সন্ত্রস্ত চৌদ্দটি মানুষ। ঐ চৌদ্দজন, অবশেষে নিজেদের পরিচয় দিলেন দেবতা বলে। রাণী হীরাবতীর কাছে মিনতি জানালেন মহিষের কবল থেকে তাদের রক্ষা করার জন্যে। এদের কথায় অবাক হলেন রাণী। বল্লেন তিনি— তোমরা দেবতাগণ যেখানে এ মহিষের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত সেখানে আমি অবলা নারী কেমন করে তোমাদের রক্ষা করবো বিরাটকার মহিষের হাত থেকে? রাণীর কথা শুনে দেবতারা বল্লেন—রাণীর বক্ষের রীছা মহিষের গায়ে ফেলে দেওয়ার জন্য। রাণী তাই করলেন। রীছার স্পর্শে মহিষের সমস্ত শক্তি তেজ রাগ ও দ্বে দূরীভূত হল। তাকে শিমুল গাছে বেঁধে বলি দেওয়া হল। নেমে আসলেন চৌদ্দটি দেবতা। দেবতারা প্রতিশ্রুতি দিলেন এ রাজ্যের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করার জন্য। তখন থেকে চতুর্দ্দশ দেবতা ত্রিপুরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়।

রীছা পার্ব্বত্যবাসীদের কাছে শুধু বক্ষ আবরণীই নয়, রীছা হৃদয়ের শাশ্বত ভালবাসার প্রতীক এবং শুভ্রতার প্রতীক হিসেবেও পরিগণিত। অশিব বিনাসে, কাল দুঃখ হরণেও এর ক্ষমতা অপরিসীম বলেও একটা অদম্য বিশ্বাস পার্বত্যাঞ্চলে বিদ্যমান। কেহ কেহ রীছার-এ ব্যবহারকে মনোবলের প্রতীক বলেও মন্তব্য করে থাকেন।

ইহা ছাড়া বাঁশের গোড়ায় কয়েকটি 'দিক' (পূজার জন্য তৈরী বাঁশের কাইম) গেড়ে দেওয়া হয়। আর কলাপাতা বিছিয়ে বিভিন্ন রকমের ফূল ইত্যাদি রাখা হয়। বিন্নী ধানের খই ভেজে পাতার উপরে দেওয়া হয়। ধূপধূনা দেওয়া হয়। মোরগ, বাচ্চা মোরগ ও ডিম গড়িয়া দেবের নামে উৎসর্গ করা হয়।

অচাই ও বারুয়া

পূজা কার্য যাঁরা সম্পাদন করেন তাঁরা 'অচাই' (পুরোহিত) ও 'বারুয়া' (পুরোহিতের সহকারী) নামে পরিচিত। অচাই ও বারুয়াকে মহান আদর্শ ও পবিত্রতা বজায় রেখে দেবপূজা করতে হয়। তাঁদের হতে হয় অতিশয় আচারনিষ্ঠ। পূজার আগের দিন নিরামিষ খেতে হয় ও স্ত্রীর সহবাস ত্যাগ করতে হয়। দেবকার্যে তিলমাত্রও ব্যতিক্রম হতে পারেনা। ব্যতিক্রম হলেই অচাই ও বারুয়ার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বলে আদিবাসীদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা আছে। তাদের আচারাদি সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে—

"অভ্যক্ষ না খায়ে তারা সুভক্ষ্য ব্যভার"।।

* * *

নারীর রন্ধন তারা নাহি করে ভক্ষ্য।
নিত্য স্নান ধৌত বস্ত্র আকাশে শুকায়।।
আকাশে শুকাইয়া বস্ত্র পবিত্রে পেরয়।
স্বহস্তে রন্ধন করি ভোজন করয়।।
দেবতা পুঁজিতে ভক্তি তারা অতিশয়।"[১]

অচাই ও বারুয়া বাতিমানি

পূজার আগের দিন থেকেই "অচাই" ও "বারুয়া" (পুরোহিত ও তার সহকারী)-কে বিশেষভাবে বলে রাখা হয়। ইহাকে ত্রিপুরী ভাষায় "অচাই বাতিমানি" (পূজার জন্য আহ্বান) বলা হয়। ইহারও একটি বিশেষ নিয়ম আছে। এখানে উল্লেখ্যযোগ্য যে, অচাইকে সাধারণতঃ রাত্রের ভাত খাওয়ার পরে পূজার জন্য অচাইয়ের ঘরে গিয়ে আহ্বান করতে হয়। ভাত খাওয়ার পূর্ব্বে আহ্বান করলে অচাইকে সারারাত্র উপোস থাকতে হয়। তাই গৃহস্বামী পূজার আগের দিন সাধারণতঃ রাত্রে গিয়ে "অচাই" বারুয়া ও "জগাল্যা"কে (উলুধ্বনিকারী) বলে আসে। তখন গৃহস্বামী এক বোতল মদ অচাইয়ের জন্য ও

১। সিংহ, কালিপ্রসন্ন রাজমালা, প্রথম লহর।

বারুয়ার জন্য আধাবোতল নিয়ে যান। জগাল্যাকে সাধারণতঃ মদ দিয়ে আহ্বান করতে হয় না। তাকে পান সুপারি দিয়ে আহ্বান করা হয় পূজার দিন জগাল দেওয়ার জন্য।

গৃহস্বামী অচাই, বারুয়া ও জগাল্যাকে কিভাবে গানের মাধ্যমে আহ্বান করেন তার কয়েকটি রীতি নিম্নে দেওয়া গেল।

অচাহনি হিক ঃ ''কছই লুবিয়া দং থেঙ্গুই ছুছুন্দা দং
আইস্রিস্রি ন গ কাফায় বা
ছামুং হুমুং দে তং ?''[২]

অনুবাদ ঃ ''অচাইয়ের স্ত্রী''— শিম, লুবিয়া, 'থেঙ্গুই', 'ছুছুন্দা' প্রভৃতির লতার অবলম্বন (অর্থাৎ পরিবারের সকলের নির্ভর গৃহস্বামী বা নকফাং) তুমি এই সকাল বেলা যে ঘরে এসে উঠেছ কোন প্রয়োজন আছে কি ?

নক ফাং ঃ— ''ওয়ান্দাল এংছানি ছুমুই,
নখা তলানি চুমুই,
খনা ফুং আইঅয় মতাই রুনানি
অচাই অংফাইদি কুমুই।''

অনুবাদ ঃ গৃহস্বামী— মৃত্তিঙ্গা বাঁশের এক গাঁট থেকে অপর গাঁট পর্য্যন্ত খণ্ডের বাঁশি, আকাশের তলার মেঘ, কাল সকালে দেবতার পূজা দিতে বনুই (জামাইবাবু) তুমি এসে 'অচাই', হও। (অর্থাৎ) ভাল বাঁশি যেমন মৃত্তিঙ্গা বাঁশ ছাড়া হয় না, মেঘ ছাড়া যেমন আকাশ সুন্দর দেখায় না, তেমনি তুমি 'অচাই' তোমাকে ছাড়াও পূজা সুসম্পন্ন হবার ও শোভা পাবার নয়। কাল সকালে আমার বাড়ীতে পূজা তাতে তুমি এসে 'অচাই' হও।

''বাড়ী মগদাম চা-নাইবা তখা
মাইতুক বগজাকনাই বাকা,
খনা ফুং আইঅয় মতাই রুনানি
বারুয়া অংফাইদি কাকা।''

অনুবাদ ঃ বাড়ীর ভুট্টাখেকো কাক, ভাতের হাঁড়ি রাখার মঞ্চ, কাল সকালে দেবতার পূজায় কাকা, তুমি এসে 'বারুয়া' (অচাইয়ের সহকারী) হও। (অর্থাৎ বাড়ীর ভুট্টা খেতে প্রয়াসী কাকের যেমন শুধু চেষ্টাই সার হয়, এবং ভাতের হাঁড়ি রাখার মঞ্চটিরও যেমন ভারবহন ও মসীলিপ্ত হওয়াই সার, তেমনি পূজার কাজেও, 'বারুয়া'রও খাটুনিই সার। পূজা সুচারুরূপে সম্পাদিত হওয়া যদিও বহুলাংশে 'বারুয়া'র কর্ম্মনৈপুণ্যের উপরই নির্ভর করে, তবু পূজায় 'অচাই'ই মুখ্য, বারুয়া গৌণ। বারুয়ার কাজ শ্রমসাধ্য অথচ সম্মানজনক নয়, তাই সহানুভূতি প্রকাশ করে আহ্বান করা হয়েছে।) এরপর ''জগ্যাল্যা'' (উলুধ্বনিকারিণী)-কে আমন্ত্রণ জানাতে হয়।

২। দেববর্মা, প্রিয়ংবদা তিপ্রা, পৃঃ ৩৭

"গাইরিং থক্‌মা মাখুমাই বুবুগ
বাবু রাইছুইমা রাইবুক্‌
কুমুই কতরব ছাক অচাই অংখায়
জগাল্যা ফাইদি বাই'ব।"

অনুবাদ ঃ টংঘরের থক্‌মা (মঞ্চ গৃহের নিম্নাংশকে 'থকমা' বলে), 'মাখুমাই'-(বন ইঁদুর জাতীয়) এর গর্ত্ত, বাবার তোলা বেতের পরিত্যক্ত অংশ, বনুই যখন নিজে 'অচাই' হয়ে যাচ্ছেন তখন তুমিও দিদি এসে 'জগাল্যা' (উলুধ্বনিকারিণী) হও। (অর্থাৎ টংঘর যেখানে সেখানেই তার গর্ত বা আশ্রয় স্থানটি কারণ মাখুমাই চোখে দেখতে পায়না বলে তার আশ্রয় স্থান ছেড়ে দূরে যায় না, এবং বাবার তোলা বেতের অংশগুলো যেমন পাশেই রয়েছে তেমনি তুমিও বনুইয়ের। কাল যেখানে বনুই নিজে 'অচাই' হয়ে যাচ্ছেন তখন দিদি তুমি এসে উলুধ্বনিকারিণী হও।)

গড়িয়া পূজা ও তার ফলাফল

বারুয়া পূজার কাজে অচাইকে পুরোপুরিভাবে সাহায্য করেন। পূজার দিন অচাই ও বারুয়া স্নান করে শুচি ও শ্বেত বস্ত্র পরে পূজার কাজে লেগে যান। গড়িয়া পূজা সাধারণতঃ 'রন্ধক' ও 'নকছু মতাই' এর পরে সুরু হয়। 'রন্ধক' পূজা ভোর সাড়ে চারটার মধ্যেই হয়। ইহার পরেই আসে 'নকছু মতাই'। নকছু মতাই'য়ের পরে প্রায় ছয়টা নাগাদ গড়িয়া পূজা সুরু হয়। শেষ হতে প্রায় এক ঘন্টা লাগে। ঠিক পূজা সুরু হওয়ার আগে অচাই এসে দেখেন নৈবেদ্য ও পূজার আনুষাঙ্গিক জিনিষগুলো ঠিক ঠিক জায়গায় বসানো হয়েছে কিনা। ঠিক না হলে বারুয়াকে আবার নির্দ্দেশ দেন নৈবেদ্যগুলো ঠিক জায়গায় রাখতে। ইহার পরই 'অচাই' 'পাত কারনা' করে পূজা সুরু করেন। 'জগাল্যা' ও জগাল দেয়। 'পাত কারনা' শেষ হলে অচাই অনেকক্ষণ মন্ত্র আওড়ে গড়িয়া দেবের প্রতীক বাঁশে 'দেবত্ব' দান করেন। ইহার পর আবার 'পাত কারনা' করে দেখেন অচাই। ফলাফল ভালো হলে মন্ত্র আওড়ে মোরগ উৎসর্গ করা হয় গড়িয়া দেবের পাদমূলে। উৎসর্গের সময় জগাল্যা জগাল দেয় ও গৃহস্বামী ও পরিবারের লোকজন সবাই এসে গড়িয়া দেবতাকে তাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানায়।

উৎসর্গের পরে কয়েকফোটা তাজা রক্ত ও মাথা ও গলার সামান্য মাংস কেটে গড়িয়ার পাদমূলে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ এভাবে রেখে পরে মাথাগুলি ঘরে আনা হয়। ইহা ছাড়া অচাই মোরগের পায়ু কেটে অন্ত্রি বের করে দেখেন অন্ত্রি ভালো অথবা ছেঁড়া কিনা। অন্ত্রি ভালো হলে পূজার ফলাফলও ভালো হয়। পূজা শেষ হয়ে গেলে ইহার মাংস ও মদ দিয়ে পূজার ভালোমন্দ ফলাফল জিগেস করেন ঘরের মালিক বা নকফাং। ইহাকে ত্রিপুরী ভাষায় 'ছেমা ছুংগ' বলে। পূজার ফলাফল জিগেস করার সময় অচাইকে এক বোতল মদ ও একটি লাঙ্গি দিতে হয়। সেই মদ অচাই নিজে একা খান না, বারুয়া জগাল্যা ও অন্যান্যকে খাওয়ান। পরিবেশন করেন ঘরের মালিক অথবা বারুয়া। পূজার ভালোমন্দ ফলাফল জিগেস করার সময় প্রথমবার অচাইকে পাত্রপূর্ণ করে

মদ দিতে হয়। 'অচাই' সেই মদ খেতে খেতে গাম্ভীর্য নিয়ে ধীরে ধীরে ফলাফল বলেন। মন্দ ফল হয়ে থাকলে গৃহস্বামীকে কি করতে হবে অচাই নিজেই ইহার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। পূজার ফলাফল জিগেস করার সময় মোরগের ডান পা অচাইকে ও বাম দিকের ডানা বারুয়াকে সিক করে মদের সঙ্গে খেতে দেওয়া হয়। জগাল্যাকেও মাংস খেতে দেওয়া হয়।

পূজা শেষ হয়ে গেলে গড়িয়া দেবের প্রতীক বাঁশের ছায়ার উপর বিশেষ নজর দিতে হয় যাতে কেহ ঐ বাঁশের ছায়া না মাড়ায় অথবা পার না হয়। কেহ পার হলে গড়িয়া দেবের কোপ দৃষ্টি পরে বলে তাদের বদ্ধমূল ধারণা।

''পা ধোয়ানো'' বা ''য়্যাকুং ছুরুমানি'' ও ''গড়িয়া নাচ''

বিকেল প্রায় তিনটে থেকেই গড়িয়া দেবের পাদমূলে মোরগের ছানা ও ডিম দিয়ে গড়িয়া দেবের পা ধোয়ানো হয়। ইহাকে ত্রিপুরী ভাষায় 'য়্যাকুং ছুরুঅ' বলে। ইহাতে গৃহস্বামীর কল্যাণ কামনা করা হয়। ইহা ছাড়া ঘরের সকলের নামে কল্যাণ কামনা করে প্রণামী দেওয়া হয় মোরগের ছানা ও ডিম দিয়ে। পা ধোয়ানো শেষ হলে ডিমগুলো ঘরে নিয়ে ভাজা করে খাওয়া হয়। তখনও অচাইকে ঐ ডিম ও মদ সামান্য পরিমাণে খেতে দিতে হয়। পা ধোয়ানোর পরে দেব ভক্তিতে মাতোয়ারা যুবক ও বৃদ্ধরা গড়িয়া দেবের প্রতীক বাঁশে বাঁধা 'রীছা' (রীয়া) খুলে নেয় ও ইহাতে কিছু জুমের তুলা, চাল ধান ও ফুল মিশিয়ে তিনটি 'গিট' দেয় এবং ইহাকে 'কল' (বর্শা) এর মধ্যে ঝুলিয়ে দেয়। ইহার পরে সেই কল কাঁধে নিয়ে দেব ভক্তিতে মাতোয়ারা যুবকেরা 'খাম' (ঢাক) এর তালে তালে গান গেয়ে গেয়ে নাচতে সুরু করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গড়িয়া দেবতাকে ঘুরানোর সময় গড়িয়া দেবের প্রতীক বাঁশ কাঁধে নিয়ে ঘোরা হয় না। ইহাকে পূজাস্থলে গেড়ে রাখা হয়। বাদ্যবাদকরা 'খাম' কাঁধে ঝুলিয়ে নাচের ভঙ্গিমায় নাচিয়েদের সঙ্গে যায় আর খামে বিভিন্ন রকমের তাল ফুটে উঠে। প্রসংগত উল্লেখ করা যায়—নাচিয়েরা শুধু নিজেদের পাড়াতেই ঘুরে ঘুরে নাচে এবং প্রত্যেক পরিবারের উঠোনে দশ থেকে পনেরো মিনিট ধরে নাচে। খামের তাল বা বোলের মধ্যে যেমন—

১। লাস—

গান্ কি ঘাঘান ঘিচন্ গান
চন্ গান্ গান্ ঘিচন ঘিচন
ঘিচন চুগান ঘিচন গান্
চন্ গান্ গান্ ঘিচন্ ঘিচন্

২। তক্‌মা মুই ক্রাকমানি—

গানি গানি ঘান্ চন্ চন্
চুগান্ গাগান্ চন্ চন্

৩। তক্‌মা খিতুং জাংরিমানি—

গানি গানি গান্ গানি চন্ চন্
গিগির ঘিচন্ ঘিচন্ চন্
(ঘাযান্ চুগান্, চুগান্ ঘান্)

৪। হারুংমাই কিছিলমানি—

গিগির গির গিগির গির
গিগির ঘিচন্ ঘিচন্ চন্
গাগানে ঘান্ গাগানে ঘান্
গাগানে ঘিচন্ চন্
(চুগা গানে গান্ গানি গানি
গানঃ গান্ কি ঘিচন্ চন্)

৫। তক্মা ইয়াচিং মাল্মানি—

চন্কে ঘাঘান্ ঘাঘান্ ঘাঘান্ চন্ চন্
গানি চন্ চন্ চন্ কি চুগান
চনি গানি গন্ চুগান্ ঘান্

৬। মায়ুং ছুন্টা চানাইমানি—

গানি চনে গান ঘিচন্ ঘিচন্ ঘিচন্
গাগান্ ঘান্ গানি চন্ চন্
চুগান্ ঘিচন গাগানে গান
গানি চনি গান ঘিচন্।

কোনো ঘরে বা বাড়ীতে পৌঁছার আগে নাচিয়েরা চীৎকার করে গৃহস্থকে জানিয়ে দেয় এই বলে—

"আইলামরে
গড়িয়া রাজা দেশ বেড়ায়
ঘর গৃহস্থী হজা গো
গড়িয়া রাজা আইসে গো
গড়িয়া রাজা বেড়াতে চায়
দেশ দেশ বেড়াতে চায়
দেশ দেশ নাচতে চায়
চৈত পরব শুনিয়া
বাড়ী বাড়ী বেড়াতে চায়
টিলা টংকর ভাঙ্গিয়া
ছাপ ছড়া শুকাইয়া
ঢোল বাজাইল উজির নাম
খরগ হৈছে বানাইয়া
গড়িয়া আইছে বানাইয়া
গড়িয়া রাজা চিন্তা নাই।"

অর্থাৎ— আমরা আসলাম, গড়িয়া রাজা দেশ বেড়াতে চায়। ঘরের মালিক তুমি সজাগ থাক। তোমাকে দেখার জন্য গড়িয়া রাজা এসেছে ইত্যাদি।

ইহার পরে বাড়ীর প্রাঙ্গণে এসে পৌছলে আবার তারা গাইতে থাকে—

গড়িয়া রাজা বইতে চায়
পানি লুটা বার কর।

অর্থাৎ— গড়িয়া দেবতা তোমার উঠানে বসতে চায়, বসার জায়গায় ঘটি করে জল দিয়ে ছিটিয়ে দাও।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গড়িয়া দেবতাকে সর্ব্বদাই পবিত্রভাবে রাখতে হয়। তাকে উঠানের যে কোন জায়গায় বসানো চলে না। বাড়ীর মালিক তখন উঠানে কিছুটা পবিত্র জল ঢেলে লেপে দিয়ে যান এবং সেখানে গড়িয়া দেবতাকে বসানো হয়। জল ঢেলে না দেয়া পর্য্যন্ত গড়িয়া দেবকে কাঁধে করে রাখতে হয়। যদি কোন বাড়ীর মালিক ঘুমিয়ে থাকে তখন গড়িয়ার সহযাত্রীগণ গায়,—

"দিন রাত চলিয়া
জল ঘটি আনসনা,
গড়িয়া রাজা বইতে চায়
দুয়ার মেলিয়া তামাসা চায়
মানিলে বইতে চায়
না মানিলে চলতে চায়
আইস গো খেরেং বাই
ডিমা পাইলে গড়িয়ায় দে
মোরগ পাইলে গড়িয়ায় দে
সোনারূপা বর ভইর‍্যা
ধান সূতা বর ভইর‍্যা
টাকা পয়সা বান্দিয়া।"

তারপর গড়িয়া দেবতাকে উঠানে বসানো হলে সবাই মিলে ঢাকের তালে তালে নাচতে থাকে ও সমস্বরে গান গেয়ে উঠে,

দুয়ার মেল, ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া নাচ

এরপরে গোলাকার হয়ে সবাই ভঙ্গিমা করে গায়,

ছাক্ বাক্ছা—ছাক্ বাক্ছা ছাক্ বাক্ছা

সকলেরই হাতে থাকে এক টুকরা কাপড়। ঠিক নাচ আরম্ভ করবার পূর্ব মূহূর্ত্তে সমস্বরে বলে উঠে,

হাতের কাপড় হমান কর।
কে — কে — কে —।

নাচের ভঙ্গিতেই হাতের কাপড়খানা কোমরে বাঁধবার সময় বলে;

আইয়া — আইয়া — আইয়া।

শক্ত করে কোমরে কাপড় বাঁধবার পর আরম্ভ হয় ঢাকের তালে তালে নাচ আর বিভিন্ন রকমের গান।

মা চাইয়া ব ফাইয়া
মা নুংয়া ব ফাইয়া
অঃ বাঙ্গলে নাইখ্‌লায় তংণায়
ব ন নাইনাছে ফাইঅ।
ভালরে ভাল ভাল।

* * * * *

গড়িয়া রাজা ছেং ক রাগ
হাতাল মুইয়া চাহায়া
রাজানি মায়ুং নাহায়া
গড়িয়া বাই তং হাম্‌য়া
অঃ বাঙ্গলে নাইখ্‌লায় তংনায়
ব ন নাইনাছে ফাইঅ।
ভালরে ভাল ভাল।

"আশীর্বাদদান" বা "বর রিমানি"

নাচ শেষ হওয়ার পর মূহূর্ত্তে ঘরের মলিক তাদের কাছ থেকে 'বর' বা 'আশীর্ব্বদ' চেয়ে নেয়। গড়িয়ার নাচিয়েরা ও সহযাত্রীরা ঘরের মালিককে 'বর' দেয়। ইহাকে ত্রিপুরী ভাষায় 'বর রিমানি' বলে। 'বর' নেওয়ার সময় ঘরের মালিক একটি থালার উপরে পবিত্র সাদা কাপড় ঢেকে ইহাতে দু'একটি রূপোর টাকা, ফুল ও তুলা রেখে দেয়। থালা হাতে করে এনে বারান্দায় এসে হাটু গেড়ে বসেন ঘরের মালিক। নাচিয়েরা তখন পরস্পরে জিগেস করে— "অ গড়িয়া ছেং করাক্। তাদের মধ্যে যে কোন একজন 'অই' বলে সাড়া দেয়, প্রথম প্রশ্নকর্ত্তা আবার জিগেস করে— তার ঘরে কি? দ্বিতীয় জন উত্তর দেয়— ধান-দুর্ব্বা।

বিসর্জন

এ বছর তোমার ঘরে সোনারূপা ফলবে বলে প্রথম ব্যক্তি ঘরের মালিককে আশীর্বাদ দেয়। ইহা ছাড়া নাচিয়েরা তখন রীয়াতে বাঁধা তুলা, চাউল, ফুল ইত্যাদি বর স্বরূপ ঘরের মালিককে প্রদান করে। ঘরের মালিক তখন এইগুলিকে যত্ন সহকারে ঘরে নিয়ে 'খুত্‌রুক' (খাড়ার ন্যায় বেত দ্বারা বোনা সিন্দুক) এর ভেতরে রেখে দেন। 'খুতরুক' এর ভেতর রাখার সময় ঘরের মালিককে এই কথা বলে ভরতে হয় "হে গড়িয়া দেবতা আগামী বছরও যাতে তোমাকে এভাবেই পূজা দিতে পারি ও তোমার বরকে (আশীর্বাদ) আমিই নিজের হাতে এভাবে গ্রহণ করতে পারি।" বরদাতারা যাওয়ার সময় ঘরের মালিককে "তোমার পরিবারে সুখ শান্তি ধন আসবে" বলে বিদায় নিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় ঘরের মালিক তাদের আধা বোতল 'আরাক' (মদ) ও একটি 'বুতুক' (লাঙ্গি) খেতে দেয়। ইহা ছাড়া ডিম, শুক্‌টি, শুকনো মাছ ও মাংস তাদের দেওয়া হয়। তারাও মালিকদের কাছ থেকে খাওয়ার জিনিষ

চেয়ে নেয়। নেচে নেচে পাড়া পরিক্রমা হয়ে গেলে বিসর্জনের পালা আসে। বিসর্জন দেওয়ার আগে গড়িয়া দেবের প্রতীক আস্ত বাঁশকে এক জায়গায় জড়ো করা হয়। ঐ বাঁশকে উপড়ানোর পূর্বে সাষ্টাংগে প্রণাম করে উপড়ানো হয়। বিসর্জন সাধারণতঃ গভীর রাত্রেই হয়ে থাকে এবং নিকটবর্তী কোন ছড়া বা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রসংগত এখানে উল্লেখ করা যায় যে, 'কল' বা বর্শাকে বিসর্জন দেওয়া হয় না। বিসর্জন দেওয়ার পূর্বে প্রাপ্ত খাবার জিনিষগুলো একজনের হেপাজতে রেখে দেয়। বিসর্জন দেওয়ার সময়ও সকলে নদীতে যায় ও বিসর্জন হয়ে গেলেই স্নান করে যার যার ঘরে ফিরে আসে। এর পর তাদের মধ্যে ঐ জিনিষগুলো খাওয়া দাওয়া হয়। পরিমাণে বেশী হলে এগুলি বয়স্ক, মধ্য বয়স্ক, যুবক যুবতীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। বয়স্ক ও প্রবীণদের মর্য্যাদা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

রন্ধক পূজা ও উপকরণ

গড়িয়া পূজার আনুষঙ্গিক পূজা হিসেবে প্রথমতঃ 'রন্ধক' পূজা দিতে হয়। সাধারণতঃ ইহা ভোর সাড়ে চারটের মধ্যেই সুরু হয়। 'রন্ধক' হল ঘরের লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক। গড়িয়া পূজার সময় রন্ধক বা লক্ষ্মী হাঁড়িতে জুমের নূতন চাল ভরে পূর্ণ করা হয়। 'রন্ধক' কখনো খালি রাখা যায় না। ইহা খালি রাখলে ঘরের লক্ষ্মী (মাইলুমা বা মালিমা) অসন্তুষ্ট হন বলে তাদের চিরাচরিত ধারণা। রন্ধক পূর্ণ থাকলে তাদের সংসারও ধনে ও জনে পূর্ণ থাকে— ইহা তাদের গভীর বিশ্বাস। তাই প্রত্যেক পরিবারই রন্ধক পূর্ণ রাখতে চেষ্টা করে। ঘরের কর্ত্তা ও কর্ত্রী প্রত্যেকদিন রন্ধকের পাদমূলে ফুল ও ধূপধূনা দিয়ে পূজা দিয়ে থাকেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জমাতিয়া সম্প্রদায় মাত্র একটি রন্ধক পূজা করে। ত্রিপুরীদের রন্ধক দুটি—একটি পরিবারের কর্ত্তার অপরটি কর্ত্রীর নামে। পরবর্তী বছরের রন্ধক পূজার আগ মুহূর্তে ইহাকে খালি করে পরিষ্কার করা হয় ও সিঁদুর দিয়ে হাঁড়ির গায়ে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা হয়। তখনই ইহাতে নূতন চাল ভরা হয়। দুটি হাঁড়ির আবার দুটি নাম—বাঁ দিকের হাঁড়িকে 'খুলুমা' ও ডান দিকের হাঁড়িকে 'মাইলুমা' বলা হয়। 'খুলুমা' পুরুষ আর 'মাইলুমা' স্ত্রী। 'খুলুমাকে' মোরগ ও 'মাইলুমাকে' মুরগী দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। 'মাইলুমা' ও 'খুলুমার' অনুগামিনী দুজন থাকে। তাদের নাম 'আবিছা কন্যা'। পূজার সময় ছোট ছোট পাতলা খণ্ডে কাটা কলা, কিছু পরিমান চিনি গুড় বাতাসা ও অল্প পরিমাণ আতপ চাল দিয়ে সাতটি বা নয়টি কুচি নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়া হয় পৃথক পৃথক পাতায়। লক্ষ্মী হাঁড়ির উপরে কয়েকটি ডিম্বাকৃত পাথর তুলা দিয়ে মুড়ে সিঁদুর মেখে সযত্নে রন্ধকের চালে গুজে রাখা হয়। এগুলো সংখ্যায় বাড়লে গৃহস্থের উন্নতি সূচিত হয় বলে তাদের একান্ত বিশ্বাস।

পূজার পূর্বে হাঁড়ির গলায় পরানো হয় হাতে কাটা 'খুতুই' (সূতো) দিয়ে গাঁথা ফুলের মালা। মালাটি সাধারণতঃ জুমের নূতন তুলা ও বনজ ফুল দিয়ে গাঁথা হয়। রন্ধকদ্বয়ের উপরে টাঙ্গানো হয় চাঁদোয়া। রন্ধকের পাদমূলে 'লাইছক' (কচি কলা পাতা) বিছিয়ে সেখানে ভিজানো আতপ চাল চার মুষ্ঠি করে দু'দিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়। লাঙ্গি (ছোট কলসী) থেকে পচাই মদের গাদ ও জল পরিমাণ মত নিয়ে কাঁচা বাঁশের চিত্রিত করা চোঙাতে ভরা হয়। ইহাকে 'চুয়াক্‌মা' বলে। আরেকটি তদ্রুপ চোঙায় ভরা হয় 'চুয়ারাক' (বোতলের মদ) রন্ধকের পাদমূলে মোরগ ও মুরগী বলি দেওয়ার পূর্বে

প্রত্যেক চালের মুষ্টিতে একটু একটু করে চোঙার মদ ঢেলে দিতে হয়। মদ প্রথমে খুলুমা ও পরে মাইলুমাকে দিতে হয়। ইহার পরে অচাই (পুরোহিত) মন্ত্র আওড়ে 'পাতকারনা' করে দেখেন। তখনই 'জগাল্যা' (উলুধ্বনিকারিণী) জগাল দেয়। পাতকারমানি ভালো ফল হলে রন্ধক দুটির পাদমূলে মোরগ ও মুরগী কাটা হয়। মোরগ উৎসর্গ হয়ে গেলে ঐ দুটি চালের মুষ্টিতে আবার পূর্ব্বের মতো মদ দেওয়া হয়। মোরগগুলির মাথা ও রক্ত চালের মুষ্টিতে দিতে হয়। গলা থেকে সামান্য মাংস কেটে সেখানে দিতে হয়। ইহার পরে মোরগ ও মুরগীর পায়ু কেটে অন্ত্রি বের করে ইহা ছেঁড়া অথবা নিখুঁত কিনা তা দেখা হয়। অন্ত্রি ছেঁড়া হলে পূজার ফলাফল অমঙ্গল সূচিত করে। আর অন্ত্রি নিখুঁত হলে মঙ্গল সূচিত করে। এরপর একটা লাঙ্গি ও এক বোতল মদ দিয়ে ঘরের মালিক অচাইকে আপ্যায়ন করেন। পূজার ফলাফল জিগেস করার সময় ঘরের মালিক একটি পাত্রে পূর্ণ করে অচাইকে মদ দেন। এরপর অচাইকে প্রণাম করে পূজার ফলাফল জিগেস করেন। অচাই এক চুমুক মদ পান করে ধীরে ধীরে পূজার ফলাফল বলতে থাকেন। পূজার ফলাফল খারাপ হলে পুনরায় পূজার জন্য গৃহস্বামীকে উপদেশ দেন। এভাবে শুভাশুভ লক্ষণ দেখাকে 'ছেমা নাইঅ' বলে। প্রসংগতঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'ছেমা ছুংমানি' সময় লাঙ্গির মদ সুস্বাদু হলে, অন্ত্রি নিখুঁত হলে এবং উৎসর্গকৃত মোরগের রক্ত ও টকটকে লাল হলে সেই বছরে গৃহস্বামী ভালো ফসল পায় বলে তাদের একান্ত বিশ্বাস।

যারা রন্ধক পূজায় বলি দেয়না তারা সাধারণতঃ পূজার জন্য 'অচাই' ডাকেনা। শুধু ধূপ ও দীপ জ্বেলে ভোগ নিবেদন করে। ভোগ নিবেদন করার পর উলুধ্বনি দেওয়া হয়। ইহার পরে একটি কাপড় দিয়ে আড়াল করে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ এভাবে আড়াল করে রাখার পর পূজার প্রসাদ পাড়া প্রতিবেশী ও নিকট আত্মীয়দের ডেকে এনে ভাগ করে খাওয়ানো হয়। প্রথম গৃহস্বামীকে প্রসাদ দিতে হয়।

"নক্‌ছু মতাই" বা "গৃহকোনদেবী"

গড়িয়া পূজার আনুষাঙ্গিক হিসেবে আরও একটি পূজা হয়ে থাকে। ইহার নাম 'নকছু মতাই'। রন্ধক পূজার পরেই 'নকছু মতাইকে' দিতে হয়। 'নকছু মতাই'— পূজা হয়ে গেলে পর 'গড়িয়া পূজা' সুরু হয়। 'নকছু মতাই' (গৃহকোনদেবী মতান্তরে মনসাদেবী) কে পূজা দেওয়ার পূর্বে অচাইকে একটি 'য়্যামফ্রা' (ছোট ছোট আকারে ফাঁক ফাঁক করে চতুষ্কোণ করে তৈরী) তৈরী করতে হয়। পূজার পরে ইহাকে ঘরের এক বিশেষ কোণায় গুজে রাখা হয়। ইহার স্থান ঘরের যে কোন 'কোণ'কে স্থির করা যায় না। সাধারণতঃ ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণকে 'নকছুমতাই'য়ের স্থান বলে স্থির করা হয়। ঘরের ঐ কোণকে বিশেষ মর্য্যাদা দিয়ে রাখা হয়। অশৌচ নিয়ে ঐ 'কোণায়' যাওয়া যায় না। 'নকছু মতাই' এর প্রতীক 'য়্যামফ্র'কে এক বছর কোণার বেড়া অথবা চালের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়। 'নকছু মতাই' পূজার সময় নূতন 'য়্যামফ্রা' তৈরী করা হয় ও পুরানো য়্যামফ্রাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূজার পূর্ব্বে অচাই ঘরের দরজার সম্মুখে উঠোনে তিনটি কাঁচা কাঁচা বাঁশের কাইম বক্রভাবে গেড়ে রাখেন। সামান্য আঁচ তুলে কাইমগুলোকে সাজানো হয়। এভাবে কাইম গেঁড়ে দেওয়াকে ত্রিপুরী ভাষায় 'খং কাইঅ' বলে। ইহা দ্বারা পূজা চলাকালীন অবস্থায় বাইরের কোন লোক ঐ ঘরে 'প্রবেশ নিষেধ'

সুচিত করে। পূজা শেষ হলে অচাই নিজে মন্ত্র আওড়ে ঐ তিনটি কাইম তুলে দ্বিখণ্ড করে ভেঙ্গে জলে ফেলে দিয়ে আসেন। নিন্দুক ও অশুভকাঙ্খীদের অভিসম্পাত যাতে ঐ ঘরের লোকদের অনিষ্ট না করে সেই উদ্দেশ্যে ঘরের দরজার সম্মুখে 'খং' দেওয়া হয়। পূজা চলাকালীন কোন দুষ্কৃতকারী অলক্ষ্যে ঐ ঘরে ঢুকে কারোর অনিষ্ট করতে চেয়েছিল কি না তার জন্য খং-এর পাদমূলে অচাই মন্ত্র আওড়ে 'পাতকারনা' করে দেখেন। ইহাকে 'কুবেংগ' বলে।

'নকছু মতাই' এর জন্যেও 'চুয়ারাক', 'চুয়াকমা' দরকার হয়। পূজার পূর্ব্বে কারুয়া লাঙ্গি (কলসী) থেকে মদের গাদ পরিমাণ মত নিয়ে চিত্রিত বাঁশের চোঙায় ভরে ও ইহাতে জল দিয়ে এক ধরণের পাচুয়া মদ তৈরী করা হয়। ইহাকে ত্রিপুরী ভাষায় 'চুয়াকমা' বলে। এই জাতীয় মদ শুধু পূজার সময়ই ব্যবহার করা হয়। অপর একটি বাঁশের চোঙায় ও 'চুয়ারাক' (বোতলের মদ) ভরা হয়। পূজার পূর্ব্বে ও পরে পাতার উপরে রক্ষিত এক মুষ্টি চালের উপর কয়েক ফোঁটা মদ দেওয়া হয়। এভাবে মদ তৈরী করাকে 'তুই কথার' বলে। এই 'তুই কথার' (পবিত্র জল) অচাই পূজার আগে স্নান করে ঘাটের পবিত্র জল ঐ দুটো চোঙার ভেতরে ভরে আনেন।

পূজার সময় 'নকছু মতাই' এর প্রতীক 'য়্যামফ্রা' ছাকে মাটিতে রেখে তার উপরে পবিত্র সাদা কাপড় রাখা হয়। য়্যাম্‌ফ্রার চারিকোণায় 'ওয়াফী' (বাঁশের কাইম) গেরে রাখা হয়। আর কাইমের উপরে সাদা কাপড় ও চাঁদোয়া খাটিয়ে দেওয়া হয়। ইহার পরে অচাই মন্ত্র আওড়ে 'পাতকারনা' করে দেখেন। 'পাতকারনা' হয়ে গেলে অচাই নকছু মতাইয়ের পাদমূলে মুরগী উৎসর্গ করেন। অন্ত্রি দেখা, ও পূজার ফলাফল বলার রীতি 'রন্ধক পূজার' ন্যায়।

জমাতিয়া সম্প্রদায়ের গড়িয়া পূজা

"খাইন" বা চাঁদা সংগ্রহ

গড়িয়া পূজা জমাতিয়া সম্প্রদায়ের সর্ব্বজনীন পূজা। গড়িয়া পূজা অনুষ্ঠিত হবার আড়াই মাস পূর্ব্ব থেকেই অর্থাৎ পনেরই মাঘ থেকে 'মতাই বালনাই' (দেব-বাহক) শ্রেণীর লোকেরা চাঁদা সংগ্রহ করার জন্য বের হয়ে যায়। চাঁদা সংগ্রহ করার সময় কোন বাঁধা নিয়ম নেই। সামর্থ্য অনুযায়ী 'খাইন' (চাঁদা) দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে চাঁদার পরিমাণ ধার্য করার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করার পূর্ব্বেই আলোচনা ও পরামর্শ হয়। 'খাইন' সাধারণতঃ নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই সংগ্রহ করা হয়।

"মতাই বালনাই" "অচাই" ও "দরিয়া"

'মতাই বালনাই' (দেব বাহক) 'অচাই' (পুরোহিত) ও 'দরিয়া' (বাদ্য বাদক) শ্রেণীর লোকেরা পূজার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁরা সবাই বংশগতভাবে পূজার সময় মর্য্যাদা পেয়ে থাকেন। 'অচাই' (পুরোহিত) তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। অচাই শ্রেণীর লোকেরা সর্বদা পবিত্রতা ও আচারনিষ্ঠা অবলম্বন করে থাকেন। সমাজেও অচাই এর প্রভাব ও ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে গ্রামে পূজা

হয় সেই গ্রামের লোকেরা অচাই, মতাই, বালনাই ও দরিয়াকে অনুরোধ করে আসতে হয়। মতাই বালনাইগণ সংখ্যায় প্রায় আট জন আর দরিয়ারা অসংখ্য থাকেন। চাঁদা সংগ্রহ ও অচাই, মতাই বালনাই ও দরিয়াদের অনুরোধ ও আহ্বান পর্ব শেষ হলে পূজার জন্য আয়োজন আরম্ভ হয়। চৈত্র মাসের শেষ তারিখ বা শেষ দিন থেকে তাদের গড়িয়া পূজা আরম্ভ হয়। গড়িয়া দেবতাকে তাঁরা 'গৌরহরি' (মহাদেব) বলে মনে করেন।

যে কোন তিথি বা বারে পূজা আরম্ভ হতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে গড়িয়া দেবতা (গৌরহরি) শুধু মাথা বিশিষ্ট থাকে। পূজার সময় বাঁশ দিয়ে হাত পা ইত্যাদি তৈরী করে উক্ত মাথার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

মতাই বাল্‌নাই কর্ত্তৃক রাজা বাঁশ স্থিরীকরন

পূজার পূর্বদিন থেকে গড়িয়া সাজানোর জন্য অচাই, মতাই বালনাই, দরিয়া ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশেষ ব্যস্ত থাকেন। পূজার পূর্বদিন যে কোন ছয়জন পবিত্রভাবে শুচিবস্ত্র পরে তিনটি নিখুঁত কাঁচা বাঁশ কেটে আনার জন্য জংগলে যান। তাঁরা জংগলে গিয়ে কোন বাঁশ ভালো ও নিখুঁততা 'পাতকারনা' করে দেখেন। অর্থাৎ এক হাত লম্বা কাঁচা বাঁশ সমান করে চিরে নিয়ে অথবা দুটি পান বা কলাপাতা জাতীয় যে কোন দুটি পাতা নিয়ে একটু উপরে তুলে মন্ত্র আওড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। একটি উপুর ও অপরটি চিৎ হয়ে পড়লে শুভ সূচক বলে ধরা হয়। দুটিই এক রকম হয়ে পড়লে অশুভ বলে ধরা হয়। এই জাতীয় শুভাশুভ নির্ধারণকে 'পাতকারমানি' বলে। শুভ সূচক হলে সেই বাঁশের নিচে ভোগ দেওয়া হয় ও পরে এক নিশ্বাসে ও এককোপে সেই বাঁশ কাটা হয়। অপর দুটি বাঁশ স্বাভাবিক উপায়ে কাটা হয়। তিনটি বাঁশ বাড়ীতে আনা হলে 'মতাই বালনাই প্রধান' কে বলা হয় আনীত তিনটি বাঁশের মধ্যে কোনটি প্রথম কাটা বাঁশ অথবা রাজা বাঁশ। প্রথম কাটা বাঁশকে 'রাজা বাঁশ' বলে অভিহিত করা হয়। 'মতাই বালনাই' তখন গড়িয়া দেবতার নাম জপে সঠিকভাবে বলে দেন। 'মতাই বালনাই' সাড়ে সাত হাত করে মেপে দুটি বাঁশ কেটে দেন। ঐ দুটি বাঁশ চিরে গড়িয়া দেবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরী করা হয়। আর বাকী বাঁশ আস্ত রাখা হয়। প্রথম বাঁশ বা উয়াথুই ফাং রাজাকে সাদা সূতা ও কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়।

"গাঁড়য়া দেবের প্রতিমূর্ত্তিতে দেবত্ব দান" ও নৈবেদ্য দান

উঠোনে একটি বড় মঞ্চ তৈরী করে মঞ্চের উপরে নিজেদের হাতের বোনা ধুতি, রীয়া, চাদর ইত্যাদিও দেবতার নামে মঞ্চের উপরে সাজিয়ে রাখা হয়। প্রথম পূজার দিন উপস্থিত নারী-পুরুষ ও ভক্তগণকে উপবাস থাকতে হয়। আর তখনই চালের গুড়ি দিয়ে মতাই বালনাই ও অচাই গড়িয়া দেবের মূর্ত্তির ন্যায় এক প্রতিমূর্ত্তি তৈরী করেন ও কিছুক্ষণ পরেই অচাই মন্ত্র আওড়ে উক্ত প্রতিমূর্ত্তিতে 'দেবত্ব' দান করেন। দেবত্ব দান করার সময় সেই প্রতিমূর্ত্তিকে শুইয়ে রাখা হয়। দেবত্ব দান হয়ে গেলে ইহাকে পিঁড়িতে বসানো হয় ও পরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। অচাই তখন শ্বেত ও শুচিবস্ত্র পরে মনে মনে মন্ত্র আওড়ে সেই প্রতিমূর্ত্তিকে উপলক্ষ করে নৈবেদ্য দেন। ইহা ছাড়া, বাঁশ দিয়ে তৈরী গড়িয়া দেবের অঙ্গে অচাই নিজে পৈতা পরিয়ে দেন। মূর্ত্তিতে নৈবেদ্য ও পৈতা দেওয়ার সময় দরিয়া ঢাক

বাজান। নৈবেদ্য দেওয়া হয়ে গেলে মতাই বালনাইকে গড়িয়া দেবতা দিয়ে দেওয়া হয়। মতাই বালনাই গড়িয়া দেবতার নাম জপে বাঁশ দিয়ে তৈরী গড়িয়া দেবতাকে হাতে নিয়ে মাটিতে তিনবার পদাঘাত করে 'এখন আমার' বলে ঘোষণা করেন। ইহার পর মতাই বালনাই গড়িয়া দেবকে কাঁধে করে খেরপাং এর কাছে নিয়ে যান। দরিয়া তখন বাদ্য বাজনা সহকারে মতাই বালনাইকে অনুসরণ করেন। ভক্তেরাও তাঁদের অনুসরণ করেন। খেরপাং এর নিকট নেওয়া হলে 'বাংচাই' নামক তুলসী দেবীকে তিনবার ঘুরানো হয়। 'বাংচাই' হল তুলসী ও অন্যান্য গাছের সমষ্টি। তিনবার ঘুরানো হয়ে গেলে 'বাংচাই' এর নিকটে গড়িয়া দেবতাকে রাখা হয়। ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন 'খেরপাং', 'অচাই', 'মতাই বালনাই', 'দরিয়া অক্‌রা' (দরিয়া সরদার) ও কয়েকজন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি গড়িয়া দেবের প্রতিমূর্ত্তিকে পা ধোয়ান। তাঁদের মধ্যে 'খেরপাং' হচ্ছেন দেব পূজক। ইনি সারাবছর মর্য্যাদা ও বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন।

গড়িয়া পূজা ও উপকরণ

গড়িয়া দেবের পা ধোয়ান হয়ে গেলে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে যারা ভোগ দিতে ইচ্ছুক তাদের আহ্বান করা হয়। পূজা সাধারণতঃ দিনের বেলা অর্থাৎ প্রায় বারোটায় আরম্ভ হয়। পূজায় প্রথম উৎসর্গ হয় 'হদানি মিছিব'। (সার্বজনীন মহিষ অর্থাৎ চাঁদা সংগ্রহ করেঁ যে মহিষ কেনা হয়)। 'হদানি মিছিব' বলি হয়ে গেলে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। ইহাও সার্বজনীন। সার্বজনীন পাঁঠা বলি হয়ে গেলে যার যার মানসীর পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। মানসীর বলির ক্ষেত্রেও মহিষ প্রথম। মহিষ বলি দেওয়ার সময় নূতন গামছা ও একটি পাঁঠা অবশ্যই বলি দিতে হয়। পূজার সময় গড়িয়া দেবতার পদস্থল থেকে কাঠগড়া পর্যন্ত একটা সাদা সূতা টানা থাকে। গড়িয়া দেবের মূর্ত্তির সম্মুখে প্রায় এক হাত দূরে একটি 'ত্রিশূল' ও পূঁনো রাখা হয়। এই ত্রিশূল ছাড়াও সেখানে আরো কুড়িটি ত্রিশুল সেখানে রাখা হয়। প্রত্যেকটি ত্রিশুলের ওজন প্রায় দশ সের করে। লম্বায় প্রায় আট হাত থেকে নয় হাত। ত্রিশূল থেকে কাঠগড়া পর্য্যন্ত দুটি সাদা সূতা দিয়ে সোজাসুজি একটা সীমানা তৈরী করা হয়। পূজা চলাকালীন সেই সূতার মাঝখান দিয়ে চলাচল নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র অচাই, মতাই বালনাই ও দরিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট সীমানা দিয়ে চলাফেরা করতে পারেন। পূজায় উৎসর্গ দেবার আগে অচাই, মতাই বালনাই ও দরিয়া তিনবার করে সূতা দিয়ে নির্ধারিত সীমানায় জল ছিটিয়ে দেন। জল ছিটানো হয়ে গেলে বলি দেওয়া আরম্ভ হয়। বিশেষ একজন মতাই বালনাইকে ঘাতকের ভূমিকা নিতে হয়।

প্রসাদ খাওয়ার নিয়ম কানুন ও পূজার ফলাফল

পূজা শেষ হয়ে গেলে যার যার প্রসাদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া সার্বজনীন প্রসাদ সবাইকে ভাগ করে খাওয়ান হয়। পূজা কার্য্য শেষ হয়ে গেলে ছয়জন অর্থাৎ 'অচাই', 'খেরপাং', 'মতাই বালনাই', 'দরিয়া অক্‌রা' ও দু'জন সর্দারকে স্নান ও পবিত্র কাপড় পরে পূর্ব নির্ধারিত ঘরে যেতে হয়। ঘরে গিয়ে প্রথম বসবেন 'অচাই' 'খেরপাং' 'মতাই বালনাই' 'দরিয়া অকরা' ও দু'জন সর্দার। তাঁদেরকে প্রথমে, ধান, দুর্বা, কার্পাস, ছিপিং (তিল) ইত্যাদি দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। ইহার পর মতাই বালনাই এক বাটি 'আরাক' (মদ) দিয়ে অচাইকে প্রণাম করে পূজার ফলাফল জিগেস করেন। মদ দেওয়ার

সময় বাটির উপরে এক টুকরো পাতা ঢেকে দেওয়া হয়। অচাই সেই মদ নিজে না খেয়ে মতাই বালনাইকে খেতে দেন। দ্বিতীয়বার দেওয়ার সময় অচাই নিজে খান। ইহার পর তাঁরা সবাই গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ও ঘরে ঘরে গিয়ে মদ খেয়ে থাকেন। মদ খাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেলে ভাত খাওয়ার প্রস্তুতি করা হয়। ভাত খাওয়ার জন্যও পূর্ব থেকেই ঘর নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়। ভাত খাবার সময়ও একটা বিশেষ নিয়ম পালন করতে হয়। 'অচাই', 'খেরপাং', 'মতাই বালনাই', 'দরিয়া অক্‌রা' ও দু'জন সর্দার পর পর বসবেন। থালা মুখোমুখি করে বিছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দু'জন সর্দারও মুখোমুখি বসে ভাত খেতে পারেন না। অচাইয়ের খাওয়ার থালা আলাদা ভাবে করা হয়। উক্ত ছয়জন ব্যক্তিকে ভাত খাওয়ানোর জন্যও আলাদা ও পবিত্রভাবে রান্না করা হয়। রান্নার সময় রাঁধুনিকে বিশেষ পবিত্রতা অবলম্বন করতে হয়। সাতদিন এভাবে তাঁদেরকে খাওয়ানো হয়। ইহা ছাড়া ভাত খাওয়ার সময় হাঁচি বা সারিবদ্ধের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বাইরের কোন লোকও ঐ ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনা। ঘর পাশাপাশি থাকলেও ঐ ঘরের কিনার ঘেঁষে চলাফেরা করতেও নিষেধ করা হয়। খাওয়ার পরে সবাইকে এক সঙ্গে উঠতে হয়। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে হাত মুখ ধুয়ে তাঁরা যার যার জায়গায় বসেন; তখন তাঁদেরকে 'কুয়াই ফাতুই' (পান সুপারি) 'দুমা' (তামাক) খেতে দেওয়া হয়। তখনও অচাইকে প্রথমে খেতে দেওয়া হয়।

"গড়িয়া দেবের পাড়া ও গ্রাম পরিক্রমন"

ভাত খাওয়ার পর সাধারণতঃ ঘণ্টাখানেক সবাই বিশ্রাম করে নেয়। ইহার পর আসে পাড়ায় পাড়ায় ও গ্রামে গ্রামে গড়িয়া দেবকে ঘুরানোর পালা। প্রথম দিন বেলা তিনটে অথবা চারটেয় বের হয়ে পড়তে হয়। কোন পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিয়ে যাওয়ার সময় উক্ত গ্রামের প্রত্যেক ঘরের মালিককে ঘরের দরজা, সিন্দুক, বাক্স ও ট্রাঙ্ক ইত্যাদি খুলে রাখতে হয়। কোন পাড়াতে অশৌচ থাকলে সেই পাড়াতে গড়িয়া দেবকে নিয়ে যাওয়া হয় না। গড়িয়া দেবকে কারোর বাড়ীতে নেওয়া হলে ঘরের মালিক সবাইকে আদর অভ্যর্থনা করেন ও অনুগামীদের সন্তুষ্ট রাখতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি খাওয়ার বস্তু, কাপড় ইত্যাদিও দিয়ে থাকেন। ইহার পর ঘরের মালিকের ইচ্ছানুসারে অচাই ও মতাই বালনাই ঘরের মালিককে আশীর্ব্বাদ দেন। এভাবে প্রতি ঘরে পাঁচ থেকে দশ মিনিট পর্য্যন্ত তাঁরা গড়িয়া নৃত্য করেন। আশীর্ব্বাদও প্রতি ঘরে ঘরে দেওয়া হয়। পুরো এক সপ্তাহ ধরে এভাবে পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে পরিক্রমন চলে। অচাই, মতাই বালনাই, দরিয়া, পাগলারা ঘুম, স্নান, খাওয়া ছেড়ে গড়িয়া দেবতাকে নিয়ে মেতে থাকেন। পরিক্রমন করার সময় ঐ ছয়জনের মধ্যে যে কোন তিনজনকে অবশ্যই গড়িয়া দেবের অতি সান্নিধ্যে থাকতে হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গড়িয়া দেবতাকে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নিয়ে যাবার সময় ইহার পাদমূলে একটা হাঁসের ডিম দিতে হয়। গ্রামে দেবতা নিয়ে পরিক্রম করার সময় হাঁস, পাঁঠা, কবোতর ও মহিষ ইত্যাদি ও পরিবারের বাৎসরিক কল্যাণ কামনা করে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়।

গড়িয়া দেবকে নিয়ে পরিক্রমন করার সময় 'পাগলা'দের ন্যায় আর একটি দল থাকেন তাদের 'বগালা' বলা হয়। বগালাদের মধ্যে সর্দ্দার স্থানীয় ব্যক্তিকে 'মোহন্ত' আখ্যা দেওয়া হয়। 'বগালারা'

খুবই রসিক ও চঞ্চল থাকেন। মোহন্ত নিজেও দর্শক ও অনুগামীদের সঙ্গে রসিকতা করেন। মোহন্তের দলে শত শত 'বগালা' থাকেন। স্ত্রী বা দর্শকদের মধ্যে কেহ দেব পূজায় অবহেলা ও অনিয়মের জন্য কোন অঘটন ঘটলে মোহন্তকে সেই রোগ সারানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। মোহন্ত তখন গড়িয়া দেবতার পা ধোয়ানো জল নিয়ে অথবা পবিত্র জল এনে মন্ত্র আওড়ে 'জল পড়া' রোগীকে খাইয়ে দেন। মোহন্ত অনেক সময় 'জল পড়া' না দিয়ে মুখেই 'তা ওয়ানাদি' (চিন্তা করোনা) বলে দেন। রোগ ও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেরে যায়। পাগলারা অনিয়ম করলেও কিছু হয় না। ঐ সাত দিন স্নান, খাওয়া ইত্যাদির তাদের কোন বাদ বিচার থাকেনা।

"বর" বা আশীর্ব্বাদ

গড়িয়া দেবতা প্রতি ঘরে ঘরে ঘুরানোর সময় পাগলারা ঘরের মালিকের কাছে খাওয়ার অনেক কিছু চেয়ে নেয়। গৃহস্বামী বা গৃহিনী তখন যাথাসাধ্য খাওয়ার জিনিষ দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করেন। কেননা সন্তুষ্ট না করলে তাদের দ্বারা অনিষ্ট হবার আশংকা থাকে। পাগলারা আশীর্ব্বাদ দেওয়ার সময় রসিয়ে রসিয়ে ঘরের মালিককে বলেন 'তুমি যা দান করেছ তা অপূরণীয়। তোমার এ দানের জন্য তুমি সুখী, ধনলাভ ও স্বর্গলাভ হবে। মালিকেরা তখন আরো খুশী হয়ে তাদেরকে টাকা, কাপড়, 'খুতুই' (সূতা) দিয়ে দেন। সেই সূতা খেরপাং এর বাড়ীতে পূজার পরে যত্ন করে রাখা হয়।

বিসর্জন

গড়িয়া পূজা সাতদিন পূর্ণ হলে আবার খেরপাং এর বাড়ীতে গড়িয়া দেবতাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে 'বাংচাই' এর সম্মুখে গড়িয়া দেবতা বসিয়ে আবার পূজা দেওয়া হয়। তখন সার্বজনীন অথবা ব্যক্তিগতভাবে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। এই সময় পাঁঠা ও কবোতর ছাড়া অন্য কোন উৎসর্গ করা হয় না গড়িয়া দেবতার নৈবেদ্য হিসেবে তখন 'গাঁজা' ও দেওয়া হয়। পূজা হয়ে গেলে ছয় জন মতাই বালনাই স্নান করে আসেন। স্নান করে বাড়ীতে এলে তাঁদেরকে 'খেরপা' এর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্বশেষ পূজার ফলাফল তাঁদেরকে জিগেস করেন। ইহার পরে ঐ ছয়জন মতাই বালনাই ঘর থেকে বের হয়ে সবাইকে গড়িয়ার প্রতিমুত্তি বিসর্জন দেওয়ার জন্য আহ্বান করেন। বিসর্জন দেওয়ার সময় প্রতিমুর্ত্তি থেকে সমস্ত কাপড় খুলে রাখা হয়। যে কোন ব্যক্তি ঐ কাপড় খুলতে পারেন। ইহার পরে যে কোন মতাই বালনাই একা গিয়ে গড়িয়া দেবের প্রতিমূর্ত্তিকে ঘাটে বিসর্জন দিয়ে আসেন। ইহা ছাড়া দেবতার জন্য তৈরী করা মঞ্চ থেকে বিভিন্ন জিনিষপত্র যেমন রামদা, ত্রিশূল ইত্যাদি ধুয়ে আনতে হয়। 'রামদা' প্রত্যেকটির ওজন প্রায় দশ বারো সের। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বলি দেওয়ার 'রামদা' ওজনে পাঁচ সের থাকে। রামদাগুলো ধোয়ার পরে মঞ্চের উপরে রাখতে হয়। ইহার পরে 'বাংচাই' এর এক স্থানে থেকে কাদা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মাখামাখি হয়। ইহার পরে তাঁরা সবাই স্নান করে আবার 'খেরপাং' এর বাড়ীতে যান। তখন তাঁদেরকে ছয় বোতল মদ দিয়ে অভ্যর্থনা করতে হয় ও খেরপাং এর বাড়ীতে তাঁদেরকে ভাত খাওয়ানো হয়।

এভাবে দু'জন ভাণ্ডারীকে দুই বোতল মোহন্তকে এক বোতল খাওয়াতে হয়। এর পর ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি দেবতার জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখার জন্য অন্যদের আহ্বান করেন। সকলের সহযোগিতায় কাপড় ও জিনিষগুলো বেতের সিন্দুক এর ভেতরে রাখা হয়। তখন অনেক যাত্রীরা দেবতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ কাপড় ইত্যাদি চেয়ে নেয়। জিনিষগুলো ঘরের ভেতরের ছাদের (Ceiling) উপর রাখা হয়। ছাদের উপরে ঐগুলো এক বছর ধরে রাখা হয়।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজা প্রথা ও রীতিনীতি কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা গেলেও উদ্দেশ্য মূলতঃ এক। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া, কলই ও রিয়াং সম্প্রদায়ের গড়িয়া পূজার প্রথা ও রীতিনীতি প্রায় মিল দেখা যায়।

ত্রিপুরার বৈশিষ্ট্য তার প্রচলিত উৎসবে পরিস্ফুট জাতীকে গভীরভাবে জানতে গেলে সামগ্রিকভাবে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির পরিচয় জানতে হবে এবং তা তার জাতীয় উৎসবেই ধরা পড়ে থাকে। পর্বত ভৈয়ামের অধিবাসীরা তাদের সংস্কৃতির রূপরেখা তুলে ধরে গড়িয়া নাচের ও গানের মাধ্যমে। ঢাকের শব্দে আদিবাসীরা হয়ে উঠে মাতোয়ারা ও চঞ্চল। শব্দের তালে তালে পা ফেলে সুরে সুর মিলিয়ে গান গায় উদ্দাম কণ্ঠে।

গড়িয়ার প্রধান অংগ নাচ-গান। এই নাচ-গানের মধ্য দিয়ে জনগণের আশা আকাঙ্খা ব্যথা বেদনা সব কিছুই ফুটে উঠে। তাই এর আবেদন এত ব্যাপক। প্রগতির নামে আমরা অতীতের অনেক কিছুই অবহেলার চোখে দেখি। কিন্তু চির পুরাতন অথচ চির নতুনের আহ্বান গড়িয়া নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে আমরা তন্ময় হয়ে যাই। তখনই বোঝা যায় আমাদের দেশের উৎসব অনুষ্ঠানগুলি কত বাস্তব কতনা সার্থকতায় পূর্ণ।

সমাপ্ত

গড়িয়া পূজারম্ভে জগাল্যা উলুধ্বনি দিচ্ছে।

গড়িয়া পূজার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন অচাই।

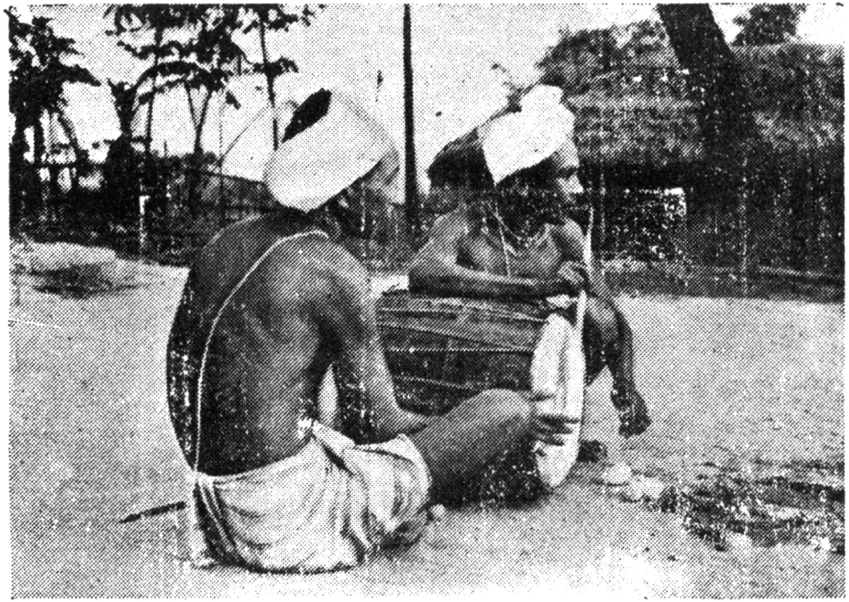

উপজাতি যুবকদ্বয় পূজায় খাম্ (ঢোল) বাজাচ্ছে।

পূর্ণপাত্র মদ দিয়ে ঘরের মালিক পূজার ফলাফল অচাইকে জিজ্ঞেস করছে।

গঁড়িয়া নৃত্যে উপজাতি যুবকেরা।

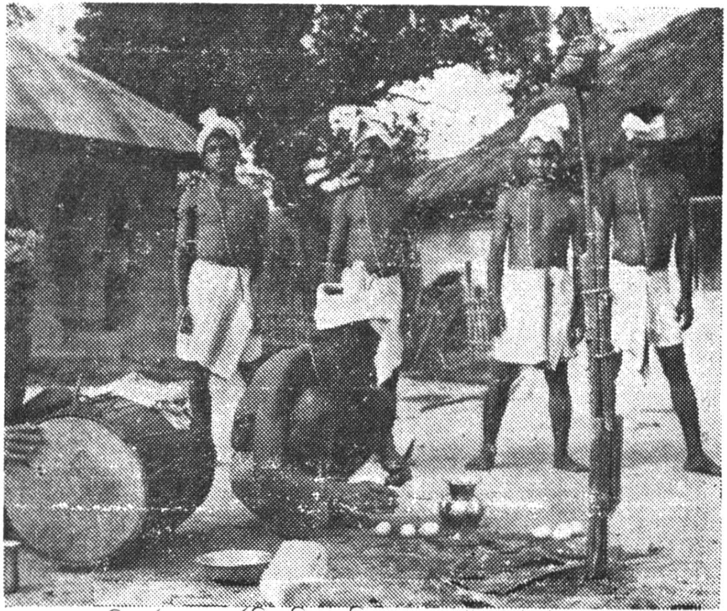

বিসর্জনের পূর্ব্বে ডিম দিয়ে গড়িয়া দেবের পা ধোয়ানো হচ্ছে।

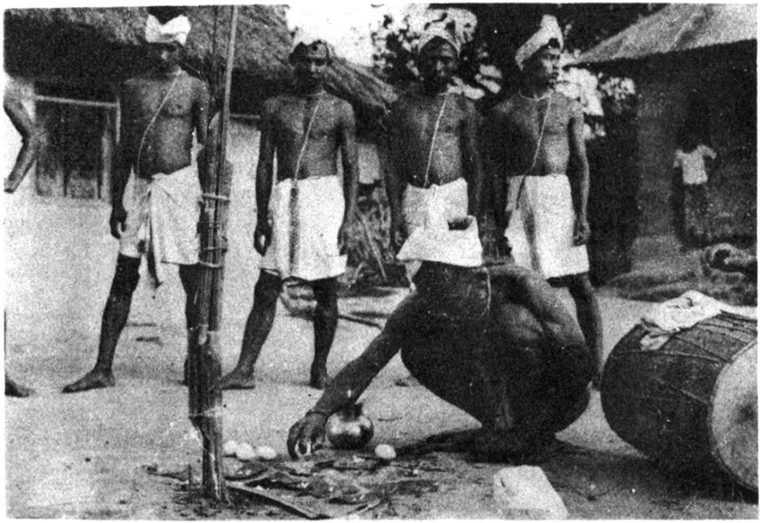

বিসর্জনের পূর্ব্বে ডিম দিয়ে গড়িয়া দেবের পা ধোয়ানো হচ্ছে।

উৎসর্গীকৃত মোরগের অস্থি নিখুঁত কিনা পরীক্ষা করছেন অচাই।

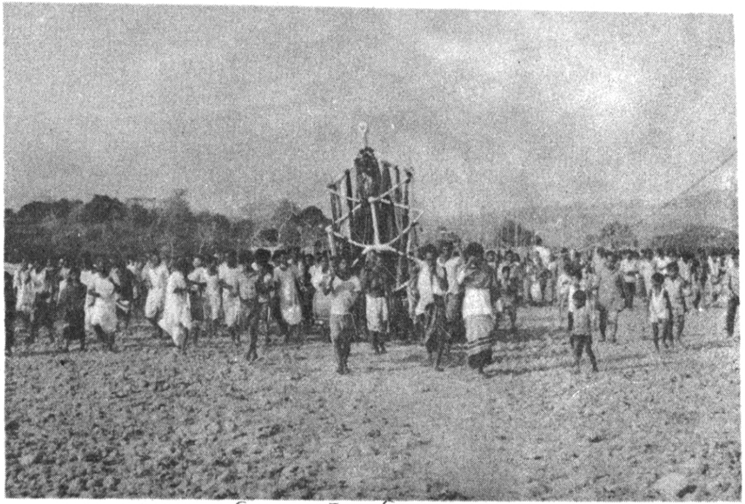

গড়িয়া নৃত্যে উপজাতি যুবকেরা।

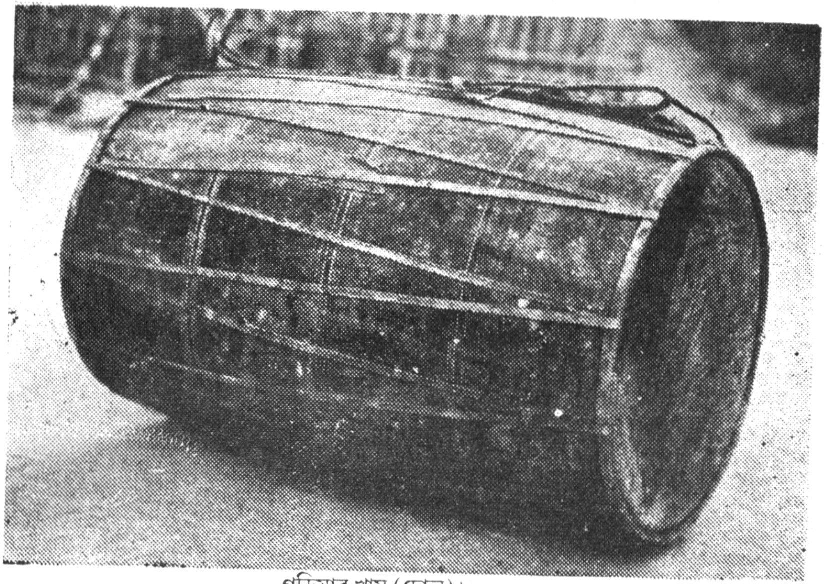

গড়িয়ার খাম্ (ঢোল)।

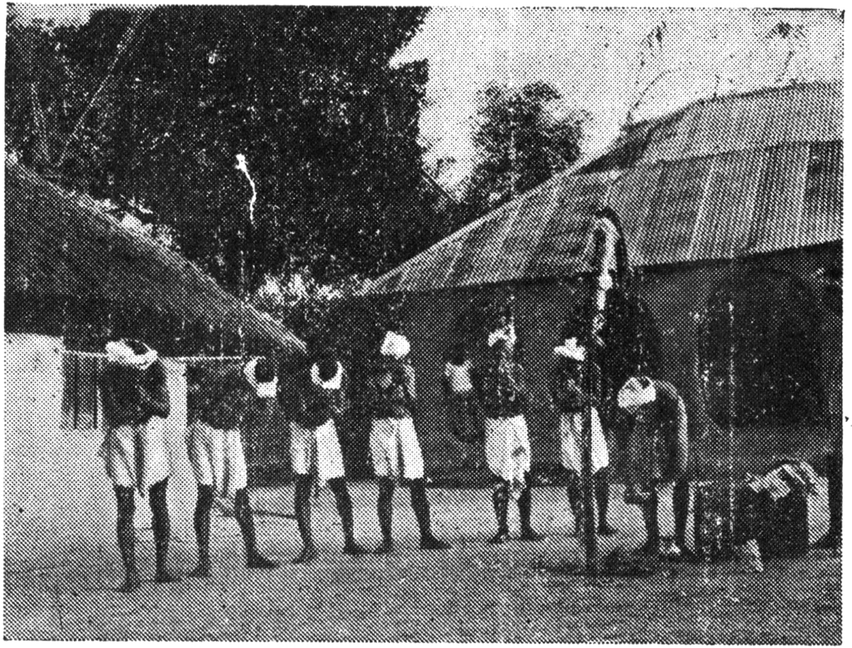

পরম ভক্তিভরে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে উপজাতি যুবকেরা।